IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 30, Issue 12, Series 1 (December, 2025) 126-128
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

রবীন্দ্র ছোটগল্প : নারীর আত্মসত্তা নির্মাণ

Ajanta Chaudhuri
Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi, India

উনিশ শতকে নারীর অধিকার যখন অনেকটাই অকল্পনীয়, তখন রবীন্দ্রনাথ নারীকে তুলে এনেছেন তাঁর লেখনীর অন্যতম ফসল ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে। সমাজের আবর্তে থেকেও তাঁর নারীরা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে, গলা তুলেছেন। নারীকে তিনি উপস্থাপন করেছেন: স্বাধীনচেতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ও সাহসী হিসেবে। শাস্ত্রে মেয়েদের বলা হয় 'পূজাহা গৃহদীপ্তয়'। কিন্তু রবীন্দ্রচেতনায় নারীকে গৃহলক্ষ্মীর সম্মানে অধিষ্ঠিত দেখার চেয়ে পুরুষের হৃদয়েশ্বরী রূপে দেখার প্রবণতা বেশি। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের গল্পে নারীমুক্তির দরজা খুলেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। নারীকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, দাঁড় করিয়েছেন পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সমাজ-সচেতন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ আসলে নারী দেখতে চেয়েছেন পুরুষের সমান করে। তাই তো 'চিত্রাঙ্গদা'-য় মণিপুর নৃপদুহিতার কথাগুলো আজকের নারীর মনের কথা–

"পূজা করি মোরে রাখিবে মাথায়, সেও আমি

নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে

পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ

মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার···

যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,

আমার পাইবে তবে পরিচয়।"[১]

এই ভাবনার আলোকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পাঠ করলে নারীর বিবিধ রূপ পরিলক্ষিত হয়। নারীর প্রতিবাদ ও পথনির্দেশ বেশ কিছু গল্পে ধরাও পড়ে। আসলে স্বল্প বা উচ্চ শিক্ষিতা নারী, রাজনীতির স্পর্শধন্যা, মানবতার উদার মূর্তি, লেখিকা নারী কিংবা বিজ্ঞানীর সান্নিধ্য পাওয়া নারী এসেছেন পরিবার বা পরিবারের গণ্ডি ছাপিয়ে - রবীন্দ্রজীবনে। তাঁর জীবন সান্নিধ্যে আসা নারীরা রেখেছেন আলোর ছাপ যেমন, তেমন তাঁর গল্পেও।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা বেশ ক'জন নারীকে পাই যাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে আধুনিকতার প্রতীক হয়ে আলো জ্বালিয়েছেন আমাদের মধ্যে। এই উত্তরণে নারী অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। এই ভাবধারায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি হল- 'দেনাপাওনা', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'অপরিচিতা' ও 'পয়লা নম্বর' মতো গল্প। এ গল্পগুলোর নায়িকারা ক্রমান্বয়ে নিরুপমা, হৈমন্তী, মৃণাল, কল্যাণী, অনিলা। এই প্রতিটি চরিত্র যেন সমাজের তথাকথিত বিবাহরীতি, সংসার ধর্ম, পণপ্রথা, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, নিপীড়নের মুখে এক একটি প্রতিবাদী রূপ। এ গল্পগুলোয় রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সমাজের যে অন্যায় রীতিনীতি তুলে ধরেছেন, একজন নারীর ও তার বাবা মাকে বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে যে অপমান, অপবাদ সহ্য করতে দেখিয়েছেন তা এখনও অনেক ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। আবার একই সাথে তাদের প্রতিবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখি। 'স্ত্রীর পত্র'-তে মৃণাল চরিত্রে এঁকেছেন নারীর সামাজিক স্বাধীনতার ছবি। যেমনটা এনেছেন, ছোটগল্প 'সমাপ্তি'-র মৃন্ময়ী, 'ল্যাবরেটরি'-র সোহিনী অথবা 'শাস্তি'-র চন্দরা চরিত্রের মাধ্যমে। এভাবেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সব নায়িকাই নারীমুক্তির মশাল জ্বেলেই উদ্ভাসিত হয়েছেন।

'দেনাপাওনা' গল্পে এক মধ্যবিত্ত বাবা রামসুন্দরের আদরের মেয়ে নিরুপমার জীবন সংগ্রামের কথা দেখা যায়। জমিদার রায়বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অনেক টাকা পণ স্বীকার করে বাবা। নিরুপমা সুন্দরী। কিন্তু সেই রূপের কোনও কদর বা আদর তার শাশুড়ির কাছে নেই। পণের পুরো টাকা দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে সে শাশুড়ির প্রবল নির্যাতনের শিকার হয়। তাই পিতা মেয়েকে সুখী করতে শেষ সম্বল, তাদের বাড়ি বিক্রি করে দেন বাবা। কিন্তু নিরুপমা টাকা দিতে বাধা দেয়, বলে - 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান।'[২] এই একটিমাত্র সংলাপে নিরুপমার ব্যক্তিত্ব ঝলসে উঠতে দেখা যায়। তাঁর এই উক্তি চিরকালীন পণপ্রথার মুখে একটা সজোরে আঘাত। শেষ পর্যন্ত অবহেলায় নির্যাতনে মৃত্যু হয় নিরুপমার। শেষ দেখাও হয় না বাবার সঙ্গে। নিরুপমার চেয়ে হৈমন্তী মানসিকভাবে দৃঢ় চরিত্রের। সে সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিলেও অপমানের যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। একসময় মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

নিরুপমার চেয়েও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হল 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তী। সৎ আদর্শবাদী গৌরীশংকরের একমাত্র মেয়ে হৈমন্তী। সে শৈশবে মাতৃহীন এবং বাবার আদরের মেয়ে। হৈমন্তীর মধ্যেও অনেকটা মাধুরীলতার ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। হৈমন্তীও সুন্দরী। সে তার বাবার সঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলে মুক্ত পরিবেশে বড় হয়েছে। হৈমন্তী মা হীন ব্যক্তিত্বের খোলা পরিবেশে বাবার কাছে থেকে বড় হয়েছে। নিরুপমার চেয়ে হৈমন্তী মানসিকভাবে আরও অনেক দৃঢ় চরিত্রের হয়ে থাকে। গৌরীশংকর

নিজের কর্ম ব্যস্ততায় মেয়ের বিয়ের বয়সের কথা ভুলে যায়। তাই সমাজের চোখে হৈমন্তীর বিয়ের বয়স একটু বেড়ে যায়। হৈমন্তীর বিয়ের বয়স বেড়ে যাওয়াতে পুরুষশাসিত সমাজে তার বিয়ে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু পুরুষের বয়স বাড়লেও পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারে এখানে নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। যদি কোন অর্থ লোলুপ পাত্রের বাবা জানতে পারে যে মেয়ের বাবার অনেক অর্থ আছে তাহলে সমাজের চোখে মেয়ের বয়স বাড়ন্ত হলেও গুরুজনদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষিত, প্রতিবাদ হীন পাত্র পেতে অসুবিধা হয় না। গৌরীশংকর লোভী অপুর বাবার সম্মতিক্রমে হৈমন্তীর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বিয়ের পর অবরুদ্ধ পরিবেশে হৈমন্তীর নতুন জীবন শুরু হয়। কিছুদিন পরে অপুর বাবা জানতে পারে গৌরীশঙ্করের অর্থের বিষয়ে যা শুনেছিলেন সবই গুজব। এরপর অত্যাচার শুরু হলে বাবার আদর্শানুসারী হৈমন্তী ছল চাতুরি দূরে ঠেলে শাশুড়ির শেখানো বুলিতে মোজে না থেকে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। হৈমন্তী সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিলেও অপমানের কন্টক শয্যায় ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই প্রবল আত্মবিশ্বাসী নারীর একসময় মৃত্যু হয়।

নারীর স্বাধীন সত্তা বিকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'স্ত্রীর পত্র'। এই গল্পের মৃণাল ছিল শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারী। দীর্ঘ পনেরো বছর স্বামীর ঘর করার পর মৃণাল তার দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছে। মৃনাল স্বামীর ঘর ছেড়ে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছে চিঠির বয়ানে নিজের বক্তব্য স্বামীর কাছে পেশ করেছে। আসলে মৃণাল সুন্দরী নারী হওয়ায় স্বামীর গৃহকোণে বন্দী হওয়ার মতো জায়গা পেয়েছিল। কিন্তু ব্যতিক্রমী শুধু বিন্দু, তাকে নিয়ে মৃণালের ভাবনার শেষ নেই। মৃণালের বড় জায়ের খুড়তুতো বোন বিন্দু, সে অনাথ, অসহায় বলে ক্ষণিকের জন্য মৃণালের স্বামীর ঘরে ঠাঁই হয়। তাই আক্ষেপোক্তি শোনা যায় মৃণালের কণ্ঠে – 'একে তো মেয়ে; তাতে কালো মেয়ে; কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে উঠে।'[৩] সংসারে নারীর অবস্থান যে কত দুঃসহ তা মৃণাল নতুন ভাবে উপলব্ধি করে। এই বিন্দুও এক সময়ে শ্বশুরবাড়ির মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পুনরায় মৃণালের শ্বশুরবাড়িতে চলে আসে। মৃণাল ব্যতীত সকলেই বিন্দুকে উন্মাদ স্বামীর ঘরেপাঠানোর জন্য তোরজোড় শুরু করে দেয়। মৃণাল কিন্তু এর তীব্রবিরোধিতা করে ধিক্কার জানায় পুরুষতন্ত্রকে। মৃণাল নিজের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করলেও বিন্দুকে বাঁচাতে পারল না। বিন্দু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলে, শেষে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। বিন্দু নিষ্ঠুর পিতৃতন্ত্র থেকে শতযোজন দূরে চলে যায় এইভাবেই। মৃণালও পরিবার, সংসার থেকে দূরত্ব বাড়াতে থাকে এরপর। স্বামীকে পাঠানো চিঠির মাধ্যমে মৃণাল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলে- 'আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।'[৪] ফলে সাংসারিক বন্দি দশা থেকে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নেয় মৃণাল। সে পুরীর তীর্থক্ষেত্রে চলে যায়। বাঙালি ঘরের একজন কুলবধূর এই সাহসী ভূমিকা ছিল সে সময়ে চমকপ্রদ। মৃণাল নিজেই বলে, সে আত্মহত্যা করবে না বরং স্বাধীনভাবে বাঁচবে-

> "মীরাবাইকে তো বাঁচার জন্য মরতে হয়নি।" 'স্ত্রীর পত্র'-র শেষ লগ্নে এসে শোনা যায় মৃণালের দৃপ্ত ঘোষণা: "...মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু-- তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম। তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন- মৃণাল।"[৫]

গল্পের আদ্যোপান্ত পাঠে উঠে আসে নারীর সাহসী জীবন, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, অবহেলা, পুরুষতন্ত্রের রূঢ়তা, শোষণ-শাসনসহ এই ভাবেই নারীর প্রতিবাদ। গল্প বলার ভঙ্গি ও তেজস্বী মেজাজ 'স্ত্রীর পত্র'কে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। রবীন্দ্রনাথের খুব কম নারী চরিত্রই এতটা প্রতিবাদী।

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্প বধু নির্যাতনের দলিল হয়ে আছে। যেখানে পারিবারিক কোন্দলকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদী চন্দরাকে দেখ যায়। ছিদাম ও দুখিরাম দুই ভাই নিত্য অভাবের সংসারে উভয়ে সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরে, দুখিরাম রাধার কাছে খেতে চায়। কিন্তু তাদের ঘরে রান্নার উপযোগী একটু চাল না থাকায় রাধা দুখিরামের ক্ষুধা নিবারণ করতে ব্যর্থ হয়। অভাবের সংসারে বড় বউ রাধা পুরুষের বশ্যতা শিকার না করে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলতে থাকে। ক্ষুধিত দুখিরাম ব্যাঘ্র তেজে লাফিয়ে উঠে রাধার মাথায় দা দিয়ে আঘাত করে। সেই মুহূর্তে রাধার মৃত্যু হয়। অমানবিকতার নজির দেখতে পাই। পরিবারে নেমে আসে অন্ধকার। মনে হয় রাধার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমাদের অশিক্ষা, নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থাই। রাধার মৃত্যুর সমস্ত দায় ছোট বউয়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। নিজের স্বামী যেভাবে চন্দরাকে দায় নিতে বলছে তা দেখে চন্দরা অবাক হয়ে যায়। ছিদাম ভাইকে বাঁচানোর জন্য ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে মিথ্যা অপবাদ স্বীকার করে নিতে বলে বউ চন্দরাকে এবং তাকে আশ্বস্ত করে - 'যাহা বলিতেছি তাই কর, তোর কোন ভয় নাই আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।'[৬] পুরুষশাসিত সমাজের এহেন নিষ্ঠুর অপরাধ চন্দরা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। স্বামীর প্রতি এতদিনের ভালোবাসা সবই ধূলায় মিশে যায়। পুরুষের তৈরি যাঁতাকলে একজন মরেছে আর একজন মরতে বসেছে। ছিদামের শেখানো তোতা পাখির মতো বুলি চন্দরা না বলে নিশ্চুপ থেকে নিজের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালাতে থাকে। স্বামীর প্রতি তীব্র ঘৃণ্য ক্ষোভে অভিমানে পুলিশ দারোগা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, হাকিম ও জজকে সে বলেছে হাঁ আমি খুন করিয়াছি। আসলে চন্দরার কাছে এই জীবন তুচ্ছ মনে হয়েছে। তাঁর কাছে এখন কাম্য মৃত্যু। একজন নারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিজস্ব প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। ফাঁসির আদেশ হলে স্বামীকে দেখতে চায় কিনা, এর উত্তরে চন্দরা বলে "মরণ এই 'মরণ' শব্দের মাধ্যমে চন্দারা স্বামীকে কটাক্ষ করেছে পাশাপাশি এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে। স্বামীর অপমান ভুলতে না পেরে অভিমানিনী চন্দরা আত্মবিনাশের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে, সেখানে স্বামী কিংবা সমাজের কোনো ভূমিকা নেই। ব্যক্তিত্বময়ী চন্দরা নারীত্বের অবমাননা ও আত্মগ্লানি থেকে বাঁচবার জন্য মৃত্যু অভিসারে যাত্রা করেছে। যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি বলে বিবেচিত হয়, সেই সমাজ পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে চন্দরা বিদ্রোহ করেছে। নিজের অস্তিত্বকে সে চিনে নিতে শিখেছে ছিদামের ঐ অলীককথনের মধ্যে দিয়ে। তারপর আর কোনকিছুর সঙ্গেই চন্দরা আপস করেনি। চারদিকের সব লাঞ্ছনা আর অপমানের মধ্যে থেকে চন্দরা সযত্নে নিজের নারীত্বকে রক্ষা করতে চেয়েছে-এইখানে সে তার সময়কে অনেকখানি অতিক্রম করে গেছে।

'পয়লা নম্বর' গল্পেও আমরা দেখি নারীর প্রতিবাদ ও নারীর ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়াস। এখানে অনিলাও মৃণালের মত গৃহত্যাগ করে প্রচলিত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছে। আসলে মধ্যবিত্ত সমাজে স্ত্রীকে বধূরূপে আবদ্ধ করে তাকে সংসারের কাজে বদ্ধ করে বহির্জাগতিক কাজে বিরত করার প্রক্রিয়া এখানে ধরা পড়েছে। এছাড়া 'উদ্ধার' গল্পের অন্যতম বিদ্রোহিনী নারী হল গৌরী। গৌরীর স্বামী পরেশ প্রথম থেকেই তার প্রতি সন্দেহবাতিক তাই দুইজনের অবস্থান ও দুই বিপরীত মেরুতে। সংসারে নারীর

কোন মর্যাদা, কোন অধিকার থাকতে পারে না। এই ভাবনা পুরুষের রক্তের স্রোতে স্রোতে মিশে আছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত পরেশ গৌরীকে গৃহকোণের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায়। তৎকালীন সময়ে নারীর জীবনধারণের জন্য অর্থ উপার্জনের সুযোগ তেমনটা না থাকায় নারীদের পুরুষের অধীনে থাকতে হতো। নারীর বাক স্বাধীনতাও খর্ব করা হতো। তেমনটা ঘটেছিল গৌরীর ক্ষেত্রে। গৌরীও ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্মের দ্বারস্থ হয়। এইভাবে গৌরীর প্রতিবাদী সত্তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এইভাবে স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর নারী বাংলা সাহিত্যে খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। স্বামী স্ত্রীর প্রাত্যহিক কলহ চরম পর্যায়ে পৌঁছায় পরমানন্দ স্বামীর, গৌরীকে লেখা চিঠিকে কেন্দ্র করে। উক্ত চিঠি কোনক্রমে পরেশের হাতে আসে। কিন্তু তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। পরেশ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অ্যাপোপ্লেক্সি রোগে মারা যায়। প্রতিবাদী গৌরী, লড়াই করে বেঁচে থাকা গৌরী আজ আর বেঁচে থাকারমাহাত্ম্যখুঁজে পায় না। সদ্য বিধবা গৌরী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায়। এই ভাবেই আমাদের সমাজে গৌরী মতো নারীরা হারিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে ভিন্নধর্মী এক প্রতিবাদী নারীর চিত্র পাই। যে একক প্রতিবাদী নায়কের সহায়িকা রাজনীতি সহযোগী; প্রকারান্তরে নায়ক সহযোগী হয়। গিরিবালা একক প্রতিবাদী শশীভূষণের সহযোগিতা করেছে। ছোটবেলাতে নায়েব কন্যা গিরিবালা পড়াশোনা বঞ্চিত ছিল। সে শিখতে পারেনি ভাইদের মত। বাবা ইংরেজ তোষক ছিলেন, আর গ্রামের শশীভূষণ অন্যায়ের বিরোধী এক পুরুষ। একক প্রতিবাদ করেন নানা সময় শশীভূষণ। সেই অপরাধে অবশেষে জেল হয় তার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, বিধবা গিরিবালা নিজগৃহে স্থান দেয় শশীভূষণকে। নীরবে সে সামাজের বিরুদ্ধে লাড়াই চালিয়ে যায়। গিরিবালার বাবা ইংরেজ তোষক হলেও, সে শশীভূষণের আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বাবার আদর্শকে নয়। ধারণ করেছে দেশের প্রতি শশীশেখরের আন্তরিক টান। ছোটবেলায় দেখা শশীভূষণের বড় বড় বই দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে নিজের ড্রইংরুমে। এইভাবেই গিরিবালার মতো নারীরা সাহিত্যে অমর হয়ে যায়।

আসলে সমাজে নারীর অবস্থান স্পষ্ট নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে নারীর আত্মানুসন্ধানের পথ খুঁজেছেন। তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই তিনি নারীর কণ্ঠে প্রয়োগ করেছেন নারীর পতিইসব, কপালের লিখনের মতো কঠিন শব্দ বন্ধন। আজও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বিন্দুদের নিষ্পেষিত হওয়ার প্রসঙ্গ স্মৃতিপটে উদয় হলে, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয় শিউরে উঠে। আর প্রতিবাদ মুখর মৃণালদের বাহবা দিতে কার্পণ্য, দ্বিধা, সংকোচ হয় না। মৃণালেরা প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নারীদের দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা, লাঞ্ছনা, সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে ভবিষ্যৎ নারীরজীবন দর্শন। রবীন্দ্র সৃষ্ট ছোটগল্পের নারীরা চেতনার আলোয় নিজেদের আবিষ্কার করতে জানে, জানে পুরুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। রবীন্দ্রমানসে নারী শুধুই কোমলতা, স্নেহ বা প্রেমের প্রতিভু নন বরং অনেক সময়ই নারী নীতির প্রশ্নে আপসহীন, সভ্যতার সংকটে বিবেক এবং সমাজ-কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে চিত্রিত। রবীন্দ্রবিশ্বের নারীরা পুরুষের ছায়ামাত্র নয়, যা সে যুগের প্রেক্ষাপটে খুবই স্বাভাবিক বলে গণ্য হতে পারত। বরং যুগের তুলনায় আশ্চর্যরকম অগ্রসর তাঁর নারীচরিত্ররা। সাহিত্য মানুষকে পথ দেখায়, চেনায়। এইভাবেই প্রগতিশীল নারীর আলোকে রবীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাওয়া আলোকিত নারী পথ দেখিয়েছেন যেমন, তেমন গল্পের নারীরা চিনিয়েছেন আলোকপথ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রাঙ্গদা' বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - চৈত্র ১৩৬১, পৃষ্ঠা- ৩৯।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' ('দেনাপাওনা'), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - চৈত্র ১৩৫৭, পৃষ্ঠা-২৬।

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' ('স্ত্রীর পত্র'), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৭৬, পৃষ্ঠা-৬৭৩।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭২।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭৫।

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' ('শাস্তি'), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - চৈত্র ১৩৫৭, পৃষ্ঠা-২৬৫।